Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 240–245
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

বাংলা নাটকের পালাবদল : গণনাট্য আন্দোলন ও বিজন ভট্টাচার্যের নাটক

সেখ আজাহারউদ্দিন
এম ফিল, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেল : kazaharuddin394@gmail.com

Keyword
গণনাট্য, মাইলস্টোন, ফ্যাসিজম, মন্বন্তর, রিলিফ, মার্কসীয়, ডাস্টবিন, ভিক্ষাবৃত্তি, লাশ, অবক্ষয়, সাঁওতাল।

Abstract
বিশ শতকের ত্রিশের দশক থেকে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ভাঙ্গন লক্ষ করা যায়। পরিবর্তে ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী শ্রেণির উদ্ভব ঘটে স্বাভাবিকভাবেই দীর্ঘদিন ধরে জমিদার নিয়ন্ত্রিত, পরিচালিত সৌখিন নাট্যশালা তার পুরাতন গৌরব হারাতে থাকে, অন্যদিকে এই শতাব্দীর চল্লিশের দশকে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে এক ধরণের শূণ্যতা তৈরি হয়। এমত অবস্থায় একদল নাট্য প্রেমী মানুষ বাংলা রঙ্গমঞ্চে এক নতুন ভাবনার আমদানী করে; যেখানে সাধারণ জনগণের জীবনের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, শোষণ-বঞ্চণা ও তাদের উত্তরণই নাটকের মুখ্য বিষয়। তাদের এই নব ভাবনায় পরবর্তীতে গণনাট্য আন্দোলনের সূচনা করে। এ প্রসঙ্গে অবশ্যই মনে রাখতে হবে গণনাট্য আন্দোলনের পুরোধা বিজন ভট্টাচার্যের কথা। তাঁর হাত ধরেই বাংলা নাটকের জগতে গণনাট্য আন্দোলনের জাগরণ ঘটে। তাঁর রচিত নবান্ন নাটকই গণনাট্য আন্দোলনের মাইলস্টোন। নবান্ন নাটকই প্রথম দেখিয়েছে সাধারণ রঙ্গালয়ের বাইরে গিয়েও সাধারণ মানুষের জন্য নাটক রচনা করা যায়। প্রথাগত দৃশ্যময়তা ও কৃত্রিমতা বর্জন করে নাট্যসংলাপ ও চরিত্রায়নের মধ্যে দিয়েও নাট্যক্রিয়ার সৃষ্টি করা যায়। গিরিশচন্দ্র ঘোষের মতো নাট্যকার যেখানে সমসাময়িক সামাজিক বিষয় নিয়ে নাটক রচনা করাকে নর্দমা ঘাঁটার সঙ্গে তুলনা করেছেন সেখানে বিজন ভট্টাচার্য তাঁর নবান্ন নাটকে প্রমাণ করে দিয়েছেন সমসাময়িকতার সঙ্গে নাট্যচর্চার কোন বিরোধ নাই। সাহিত্যের আর পাঁচটা শাখার মতো নাটকও সমকালীন বিষয় নিয়ে সাহিত্য রচনার দাবি রাখে। পরবর্তীতে বিজন ভট্টাচার্যের অবরোধ, জীয়নকন্যা, মরাচাঁদ, কলঙ্ক, গোত্রান্তর, ছায়াপথ, দেবীগর্জন প্রভৃতি নাটকে এই নবায়ত গণ সাংস্কৃতিকবোধকে আরও সমৃদ্ধ করেছেন।

Discussion

বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও সাড়া জাগানো আন্দোলন হল গননাট্য আন্দোলন।বিশ শতকের চল্লিশের দশকে গণনাট্য আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। যদিও বিশ শতকের ত্রিশের দশক থেকেই এর সলতে পাকানোর কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। ঠিক এই সময় পর্বেই ভারতবর্ষে বিশেষত বাংলার সর্বত্রে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার গোড়া পত্তন লক্ষ করা যায়। ফলে জমিদার শ্রেণির অবলুপ্তি ঘটে। শহর কিংবা গ্রামে গড়ে ওঠা সৌখিন নাট্যশালা পুরাতন গৌরব হারাতে থাকে। এ রকম পরিস্থিতিতে একদল নাট্য প্রেমী যুবক বাংলা রঙ্গমঞ্চে নতুন একটি ভাবের উন্মোচন ঘটায়। এই ভাবনা ক্রমে আন্দোলনের রূপ নেয়, যা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে 'গণনাট্য আন্দোলন' নামে পরিচিত। বলা বাহুল্য, বাংলা নাট্য সাহিত্যের ভুবনে এই গণনাট্য আন্দোলনের সূচনা ও ব্যাপ্তি ঘটেছিল যাঁর হাত ধরে তিনি হলেন নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য (১৯০৬-১৯৭৮)। সেই অর্থে বাংলা গণনাট্য আন্দোলনের পুরোধা বিজন ভট্টাচার্য। 'জনযুদ্ধ' পত্রিকার বিজ্ঞপ্তির হাত ধরেই তাঁর গণনাট্য সঙ্ঘে পদচারণা। পরে সাংবাদিকতার চাকরি ছেড়ে পাকাপাকি ভাবে গণনাট্য সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। তাই গণনাট্য আন্দোলনের কথা বলতে গেলে স্বাভাবিক ভাবেই বিজন ভট্টাচার্যের কথা এসে পড়ে।

গণনাট্য আন্দোলনের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে একথা সর্বাগ্রে স্মরণ করা প্রয়োজন যে, গণনাট্য আন্দোলন শুধু বাংলা সাহিত্যের পট পরিবর্তনের মধ্যে আবদ্ধ কোনো আন্দোলন নয়। এই আন্দোলনের প্রভাবে বাংলার আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে বাঙালি জীবনে সর্বাঙ্গীন বিকাশ ঘটেছিল। আসলে,

> "গণনাট্য আন্দোলন শব্দটি একটি বিশেষ সময়ের সন্ধিক্ষণের দলিল।নাট্যমঞ্চ ও পরিবেশের গতানুগতিকতা যখন বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল সেই মুমুর্ষ নাট্য অঙ্গনে একরাশ তাজা বাতাসের সুগন্ধ নিয়ে এসেছিল এই আন্দোলন। 'গণনাট্য' র অর্থ শুধু জনতা বা গণের নাটক নয়, সেই সঙ্গে একটি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক তথা নাট্য আন্দোলনও বটে।"[১]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের রণ দামামা শেষ হতে না হতেই বিশ্বের বুকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণবাদ্য বেজে ওঠে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো ভারতবর্ষেও এর প্রভাব ছিল সদূর প্রসারী। বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি ভারতবাসী সহ সাধারণ বাঙালি জীবনে চরম দুর্গতি এনেছিল।সমাজ জীবনের এই অভিঘাত বাংলা সাহিত্যে বিশেষত বাংলা নাটকে বিষয় ও শিল্পরীতির মধ্যে একধরণের বিপ্লব এনে দিয়েছিল। বাংলা নাটকে এই বিপ্লব বৃহৎ অর্থে গণনাট্য আন্দোলন। চল্লিশের দশকে সূচনা পর্বে বাংলা রাজনৈতিক জীবনের পট পরিবর্তন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিসম্পাত, ফ্যাসিজমের খবরদারি, মন্বন্তরের অভিঘাত, পৃথিবী ব্যাপী মৃত্যু ক্ষুধা, বেঁচে থাকার তাগিদে একমুঠো নোংরা খাবারের জন্য মানুষ ও কুকুরের লড়াই, প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধের অবক্ষয়, কৃষকদের দুর্দশা, বেকার সমস্যার তীব্রতা প্রভৃতি বাঙালি জীবনের নিত্য সঙ্গী হয়ে পড়েছিল। এই বিশ্রী কাতর পরিস্থিতি বাঙালি সমাজ জীবনের মতো সাহিত্য সংস্কৃতিতেও গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এহেন পরিস্থিতিতে বাংলা গণনাট্য আন্দোলনের সূত্রপাত। এ প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য স্মরণীয়–

> "এই আন্দোলনকে আকস্মিক উত্তেজনার ফলে সৃষ্ট একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ গণ আন্দোলন বলিয়া মনে করিলে ভুল করা হইবে।একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ইহার পশ্চাতেও জাতির একটা সুদীর্ঘ তপস্যা অলক্ষিতে শক্তি সঞ্চার করিয়াছে।"[২]

ফ্যাসীবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের সাংস্কৃতিক শাখা হিসাবে গণনাট্য আন্দোলনের প্রথম আত্মপ্রকাশ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতি দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, মোড়ক, বন্যা, ঝড় অন্যদিকে কালোবাজারি, মুনাফাবাজী ইত্যাদি ভারতীয় গণনাট্য সজ্ঘকে জনগণের সামনে এগিয়ে আনতে উজ্জীবিত করেছিল। বাংলার মানুষের এই বিপদের কথা সবাইকে জানানো, অন্য প্রদেশের লোকের কাছে বার্তা পৌঁছে দেওয়া এবং নানা জায়গা থেকে অর্থ সংগ্রহ করে 'পিপলস রিলিফ কমিটি' কে দেওয়া; এইসব নানা কাজে এই সঙ্ঘের ক্রিয়াকলাপ শুরু হয়।গানে, নাচে, ছোটো ট্যাবলো কিংবা নাটকে সাড়া দেশবাসীর মনোবেদনা ও প্রতিরোধের ছবি এরা দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে দিতে লাগল।

"শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, অত্যাচারী মুখোশ খুলে ধরা, মুনাফাখোর, মজুমদারের বদমায়েশী প্রকাশ করা, অর্থনৈতিক শোষণ, সামাজিক অবক্ষয়ের পরিণাম এবং এর সঙ্গে মুক্তিকামী মানুষের জীবন সংগ্রাম প্রতিরোধ ও বাঁচার লড়াইকে সামনে এনে।মানুষের মুক্তি ও শ্রেনিহীন সমাজ গঠনের উপস্থিতি সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করা– এই ছিল ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের সকল সাংস্কৃতিক কাজের অনুপ্রেরণা।"[৩]

গণনাট্যের প্রয়োজনে যখন নাটক দরকার, তখন হাতের কাছে তেমন নাটক না থাকায় 'জনযুদ্ধ' কাগজে নাটিকা চাই বলে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। তাতেও সাড়া না পেয়ে ফ্যাসিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের তরুণ লেখকদের উৎসাহিত করা হতে থাকে। বলা বাহুল্য, নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য এদের তাগিদেই নাট্যরচনায় উদ্যোগী হন। তাঁর প্রথম একটি প্রচেষ্টা ঠিক মতো দানা না বাঁধায়, তিনি এবারে 'আগুন' লিখলেন। পরে সাংবাদিকতার চাকরি ছেড়ে বিজন ভট্টাচার্য পাকাপাকি ভাবে গণনাট্য সঙ্ঘে ফুলটাইমার হিসাবে কাজ করতে থাকেন। নাটকের মধ্যে দিয়ে শ্রেণি সচেতন সমাজ বিশ্লেষণ, প্রতিবাদ ও সংগ্রামের যে জেহাদ ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ করতে চেয়েছিল, বিজনবাবু তারই ভাবনায় উদ্দীপ্ত হয়ে নাটক রচনায় প্রয়াসী হন।বাংলাদেশের সেই দুর্যোগের দিনে তিনি বাংলার গ্রামে গঞ্জে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। মানুষের ব্যথা বেদনা জর্জরিত মর্মান্তিক কাতর কণ্ঠ তিনি কান পেতে শুনেছিলেন।সামাজিক ও রাজনৈতিক শোষণ বঞ্চনার জাঁতা কলে পড়ে সাধারণ হাভাতা মানুষের দুঃসহ জীবনযাত্রা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। এইসব সর্বহারা মানুষের জীবনচ্ছবি তার নাটকে উঠে এলো। এই পর্বেই মানবতাবাদী বিজন ভট্টাচার্য সাম্যবাদী আর্দশে উত্তরিত হন। শুধু অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতি নয়–আসলে একটি বিশেষ দর্শনও তাঁকে ভাবিয়েছিল। একমাত্র মানবতার ওপর নির্ভর করে কোনো নাট্যকারের এই পথে উত্তরণ সম্ভব নয়। বৈজ্ঞানিক সমাজ ভাবনাই বিজন ভট্টাচার্যকে এই পথ দেখিয়েছে এবং সেটা ঘটেছে ক্রমে ক্রমে। 'আগুন', 'জবানবন্দী' এবং 'নবান্ন' পরপর পাঠ করে দেখলেই পাঠক এই পারম্পর্যটি অনুধাবন করতে পারবে। আসলে ব্যক্তিগত জীবনে মার্কসীয় আর্দশে বিশ্বাসী বিজন ভট্টাচার্যের নাটকেও সেই মার্কসীয় ভাবনার সুর অনুরনিত হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর নাটকে গণনাট্যের জয়োচ্ছাস প্রতিধ্বনিত হবে তা আর বলার উপেক্ষা রাখে না।

বিদ্যালয়ের ছাত্রবস্থা থেকেই বিজন ভট্টাচার্যের সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত। তবে তাঁর নাট্য জীবনের পথ চলা শুরু হয় ১৯৪২ সালের পর থেকে। তাঁর নাটক গুলি অভিজ্ঞতা ও বাস্তব জীবনবোধে সমৃদ্ধ। গ্রাম বাংলার নামগোত্রহীন, অনুন্নত, অশিক্ষিত হতদরিদ্র কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষেরাই তাঁর নাটকের পাত্রপাত্রী। বিজন ভট্টাচার্যের প্রথম নাটক 'আগুন' (১৯৪৩)। এটি ২৩শে এপ্রিল, ১৯৪৩ সালে অরনি পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ঐ বছরই মে মাসে নাট্য ভারতী মঞ্চে প্রথম অভিনীত হয়। নাটকটি পাঁচটি দৃশ্যে রচিত। প্রথম অভিনয়ের নির্দেশক ছিলেন নাট্যকার নিজেই। বাংলা গণনাট্য সঙ্ঘের এটিই প্রথম প্রযোজনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এদেশে যে খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছিল তারই পটভূমিতে নাটকটি রচিত।"আগুন"নাটক সম্পর্কে "নবান্ন" নাটকের ভূমিকায় নাট্যকারের বক্তব্য,

"তদানীন্তন সামাজিক অবস্থার 'আগুন' একটি পরীক্ষামূলক ক্ষুদ্র নাটিকা।"[৪]

নাটকটি নাট্যকারের তেমন কোনো প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করে না। নাটক হিসাবেও এটি পুরোপুরি সফল নয়। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালীন মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে মধ্যবিত্তের জীবন সংকটের ছবি এখানে স্পষ্ট।পাশাপাশি সমাজকীট স্বরূপ দালাল, ধান্দাবাজ, কলোবাজারি, লম্পট মহাজনদের চরিত্রগুলো সফল ভাবে উন্মোচিত হয়েছে। মন্বন্তর পীড়িত মানুষেরা মহাজনদের কাছে ছিল ইতর প্রাণীদের সমতুল্য। এর প্রমাণ মেলে নিচের সংলাপটিতে—

"সিভিক গার্ড : থাক তোকে আর দালালি করতে হবে না। যা ভাগ, ভাগ।
চতুর্থ পুরুষ : (অপমানিত হয়ে) আমি কুকুর নই।
সিভিক গার্ড : মানুষ নাকি!"[৫]

নাটকের শেষের দিকে নাট্যকার অত্যাচারিত, শোষিত মানুষের ঐক্যতা দেখিয়ে তাদের জয়ের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তার প্রমাণ মেলে প্রদত্ত উক্তিটিতে—

"এখন বাঁচতে হবে।বাঁচতে হলে মিলে মিশে থাকতে হবে, ব্যাস।"[৬]

যা আসলে গণনাট্য পর্বের নাটকের বিষয় ভাবনাকে সম্পূর্ণতা দিয়েছে।

বিজন ভট্টাচার্যের দ্বিতীয় ও প্রথম মুদ্রিত নাটক 'জবানবন্দি'। এটি **১৯৪৩** সালে **১৯** অক্টোবর 'অরনি' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। গণনাট্যের প্রযোজনায় স্টার থিয়েটারে **১৯৪৪** সালে জানুয়ারি মাসে নাটকটি অভিনীত হয়। এটিই বিজন ভট্টাচার্যের সবচেয়ে বেশি অভিনীত নাটক। দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে গ্রাম্য কৃষকের জীবনের অসহায়তা, শোষণ, বঞ্চনা নাটকটির বিষয়। নাটকের শুরুতেই চোখে পড়ে পরিবারের কর্তা পরাণ মন্ডল দু-মুঠো খাবারের আশায় পরিবার সহ কলকাতায় আসে। ফুটপাতে কোনোরকম তাদের আশ্রয় মেলে। সেখানেই খেয়ে, না খেয়ে দিন কাটে। অনাহারের তাড়নায় অপুষ্টিতে ভুগে বেন্দার ছেলে মানিক পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। পতিভক্তি পরায়ণ রমনী দুবেলা দু-মুঠো খাবারের সংস্থানের জন্য অর্থের বিনিময়ে নিজের সতীত্বকে বিসর্জন দেয়। নাটকের শেষে আমরা দেখি পরাণের মৃত্যু দশা। মৃত্যুর পূর্বে সে সকলকে গ্রামে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানায়। নাটকটিতে শ্রেনি সংগ্রামের তেমন কোনো জোড়ালো আবেদন লক্ষ্য করা যায় না। তবে বেন্দার মধ্যে দিয়ে নাট্যকার শহরের ছদ্মবেশী ভদ্রলোক ও ঈশ্বরের বিরূদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ফুটিয়ে তুলেছেন। নাটকের শেষে পরাণের গ্রামে ফেরার আহ্বানের মধ্যে দিয়ে বাঁচার প্রতিধ্বনি শুনিয়েছেন নাট্যকার।মাঠের রাজা পরাণের সংলাপে—

> "আমার, আমার সেই মরচে পড়া লাঙল ক'খানা আবার শক্ত করে চেপে ধরগে মাটিতে। খুব শক্ত করে চেপে ধরবি। সোনা, বেন্দা, সোনা ফলবে, সোনা ফলবে।"[৭]

এহেন ইতিবাচক উক্তি আসলে গণনাট্যেরই জয়গান।

গননাট্য আন্দোলনের ধারায় সর্বাধিক আলোড়ন সৃষ্টিকারী নাটকটি হল বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটক। সমালোচকদের দৃষ্টিতে 'নবান্ন' নাটকটি আসলে গণনাট্য আন্দোলনের মাইলস্টোন। এটি নাট্যকারের শ্রেষ্ঠ নাটকও। নাটকটি প্রথম **১৯৪৪** সালে 'অরণি' পত্রিকায় প্রকাশ পায়। পরে গণনাট্য সঙ্ঘের প্রযোজনায় **১৯৪৪** সালে **২৮** শে অক্টোবর শ্রীরঙ্গনাট্য মঞ্চে প্রথম অভিনীত হয়। নাটকটি পনেরোটি দৃশ্য সমন্বিত চারটি অঙ্কে বিন্যস্ত। **১৯৪৩** সালের মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে 'নবান্ন' নাটকটি রচিত। নাটকের প্রথম ও চতুর্থ অঙ্কের কাহিনী মেদিনীপুরের আমিনপুর গ্রামের। অন্যদিকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কের কলকাতা শহরকেন্দ্রিক। মেদিনীপুর জেলার আমিনপুর গ্রামের দাঙ্গা হাঙ্গামার দৃশ্য বর্ণনার মধ্যে দিয়ে নাটকটির কাহিনীর সূত্রপাত। আকস্মিক বন্যা ও সাইক্লোনে আমিনপুর গ্রাম প্লাবিত ও ছিন্নভিন্ন। সারা গ্রাম দুর্ভিক্ষের কবলে জর্জরিত। বাঁচার তাগিতে সহায় সম্বলহীন নিরন্ন মানুষগুলি শহর কলকাতায় ভিড় জমায়। কর্মসংস্থানের বন্দোবস্ত করতে না পেরে অসহায়ের মতো ভিক্ষাবৃত্তির পথ বেছে নেয়।তবে তাতে তাদের কোনো সুরাহা মেলেনি।ক্ষিদের তাড়নায় ডাস্টবিনে পরিত্যক্ত নোংরা খাবার নিয়ে কুকুর ও মানুষের লড়াইয়ের মর্মান্তিক দৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। শহরের আসে পাশে ছিটিয়ে রয়েছে অভুক্ত মানুষের লাশ। অন্যদিকে শহর কলকাতায় চলতে থাকে চোরাচালান, কালোবাজারি ও নারী ব্যবসার রমরমা। কালীধন ধাড়া ও হারুদত্তের মতো মানুষ রূপী পশুরা এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এরাই আসলে ভয়াবহ বিভীষিকাময় মন্বন্তরের আয়োজকের কালো ছবি। যুদ্ধ, মন্বন্তর, মহামারী, মৃত্যু, চোরাচালান, অনাহার, কালোবাজারি ইত্যাদি দুঃস্বপ্নে ভরা বাঙালি জীবনের ছবি 'নবান্ন' ফ্রেমে ধরা পড়েছে। আর এই দুঃস্বপ্নের জীবন সংগ্রামই হয়ে উঠেছে সমকালীন 'সামাজিক অবক্ষয়ের দলিল'। তবে সমাজের এই অবক্ষয়ই নাটকের শেষ কথা নয়।তাই নাটকের চতুর্থ অর্থাৎ শেষ অঙ্কে আমরা দেখি ইতিবাচক সুর। আমিনপুর গ্রামের মানুষেরা কলকাতা ছেড়ে তাদের গ্রামে ফিরে গেছে। গ্রাম তাদের হারিয়ে যাওয়া সম্পত্তি ফিরিয়ে দিয়েছে। গ্রামবাসীরা আশার আলোয় নবান্ন উৎসবে মেতে উঠেছে।

এরপর বিজন ভট্টাচার্যের পূর্ণাঙ্গ নাটক 'অবরোধ'লেখা হয় **১৯৪৬-১৯৪৭** সালে। নাটকটি ছ'টি অঙ্ক এবং বারোটি দৃশ্যে বিন্যস্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে শ্রমিকদের উপর শোষণ, অত্যাচার, অসহায় দুর্দশার ছবি নাটকটিতে ফুটে উঠেছে। পাশাপাশি মালিক শ্রেণির সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণির দ্বন্দ্ব, ঈর্ষা ও শ্রমিকদের প্রতিবাদী আন্দোলন নাটকটিকে পূর্ণতা দিয়েছে। নাটকে ওসমান, গজানন, রেবতীবাবুর চরিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

বিজন ভট্টাচার্যের পরবর্তী রচনা 'জীয়নকন্যা' (১৯৪৮)। এটি একটি গীতিনাট্য। হিন্দু ও মুসলমানের দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে নাটকটি রচিত। 'জীয়নকন্যা' বেদেদের জীবনকথা। বাল্য কৈশোরে বিজন ভট্টাচার্যের গ্রামীণ জীবন অভিজ্ঞতা, তরজা ও কবিগানের প্রতি ভালোবাসারবাস্তব রূপায়ন 'জীয়নকন্যা'। পরাধীনতার বিষে জর্জরিত উলপী ভারতের প্রতীক

স্বরূপ। উলপীকে সাপে কাটা ও তার পুনর্জীবন আসলে জাতীয় মুক্তির প্রতীক। নাট্যকার এই নাটকটিতে বাংলার মহামারী রুখতে সব শ্রেণির মধ্যে ঐক্য আনতে চেয়েছেন। সেই জন্যই নাটকে বোধ হয় কমিউনিস্ট পার্টি, কংগ্রেস, লীগ ঐক্যের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। নাটকে ব্যবহৃত দাঙ্গা বিরোধী বিখ্যাত গান 'ও হোসেন ভাই দামুক দিয়ার চাচা' গণনাট্য আন্দোলনের একটি ঐতিহাসিক দলিল।

চব্বিশ পরগনা জেলার অন্ধ গায়ককে নিয়ে লেখা 'মরাচাঁদ' নাটকটি।নিউ এম্পায়ার মঞ্চে নাটকটি **১৯৬১** সালে **৩১**শে মার্চ কলকাতা থিয়েটার অভিনয় করে। অন্ধ শিল্পী পবন তার স্ত্রী রাধাকে নিয়ে গান গেয়ে জীবন কাটায়। তবে গান পবনের পেশা নয়, নেশা। কিন্তু স্ত্রী রাধা সেসব বুঝতে চায় না। সে সংসারে স্বচ্ছলতা চায়। তাই এক সময় পবনকে ত্যাগ করে কেতকাদাসের সঙ্গে ঘর ছাড়ে। পবন হতাশায় ভেঙে পরে। এমত অবস্থায় একদিন পবন খাদ্য দাবি সভায় গান করার আমন্ত্রণ পায়। শিল্পী পবনের গানে প্রকাশ পায় বুভুক্ষু মানুষের মনোবেদনা, মনো ইচ্ছা। আসলে গণসংগঠনই পারে গণসংস্কৃতিকে রক্ষা করতে একথায় নাট্যকার নাটকটিতে দেখাতে চেয়েছেন।

বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাঁওতাল জীবন নিয়ে রচিত 'কলঙ্ক' নাটক। নাটকটি **১৯৫০-৫১** সালে তিনটি সংখ্যায় 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আদিবাসী সাঁওতালদের জীবনের সুখ দুঃখের ইতিবৃত্ত রূপ পেয়েছে আলোচ্য নাটকটিতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গোরা সৈন্যরা এই আদিবাসী পল্লীতে আস্তানা পেতেছিল। আদিবাসীরা গোরা সৈন্যদের নানা কাজকর্ম করে দিত। সেই সুযোগে আদিবাসী সাঁওতাল কন্যা রত্নাকে হতে হয়েছে তাদের লালশার স্বীকার। ফলশ্রুতিতে জন্ম নিয়েছে শিশু। শিশুটিকে হত্যা করে অন্যায়ের প্রতিবিধান হবে না জেনে সাঁওতালরা গোরাদের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রামে লিপ্ত হয়। 'কলঙ্ক' একাঙ্কের উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে 'দেবীগর্জন' নাটকটি রচিত হয়।

বিজন ভট্টাচার্যের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য নাটক 'গোত্রান্তর'। নাটকটি **১৯৫৭** সালে আগস্ট মাসে 'শারদীয় বসুমতি' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। কলকাতা থিয়েটারের প্রযোজনায় **১৯৫৯** সালে **১৬** আগস্ট নিউ এম্পায়ার মঞ্চে নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়। ছিন্নমূল পূর্ববঙ্গবাসীর ভাগ্য বিপর্যয়কে কেন্দ্র করে নাটকটি রচিত। একজন স্কুল শিক্ষক ভদ্র মধ্যবিত্ত জীবন থেকে বিচ্যুত হয়ে কিভাবে বস্তিবাসী শ্রমিক জীবনের সঙ্গে একাত্মা হয়ে পড়লেন সেই কাহিনি নাটকে তুলে ধরা হয়েছে। শিক্ষক হরেনবাবুর নেতৃত্বে ভাঙা বস্তি গড়ে তোলার মধ্যেই হরেনবাবুর গোত্রান্তর ঘটেছে।

কলকাতার ফুটপাতে ঝুপড়ি বাসিন্দাদের নিয়ে 'ছায়াপথ' নাটকটি রচিত। অসহায় কানা ও খোঁড়া এবং ভাগ্য বিড়ম্বিত চাষী পরিবারের কাহিনি আলোচ্য নাটকের বিষয়বস্তু। 'নবান্ন' নাটকের মতো এখানেও বন্যা বিপর্যয়ের কথা আছে। চাষী পরিবার বন্যা কবলে পড়ে সহায় সম্বল হীন হয়ে যায়। পরে ক্রমে অবস্থার পরিবর্তন ফেরে। চাষী সোনালী ধানের স্বপ্ন দেখে। চাষীর ছেলে গোপাল খেলনা লাঙল নিয়ে চাষ-চাষ খেলা করে। একই ফুটপাতে কানা–খোঁড়া ও চাষী পরিবারের জীবন চিত্র অঙ্কনে নাট্যকারের মুন্সিয়ানার পরিচয় মেলে।

'নবান্ন' পর বিজন ভট্টাচার্যের সর্বাধিক সাড়া জাগানো নাটক 'দেবীগর্জন' (**১৯৬৯**)। নাটকটি **১৯৬৬** সালে লিখিত হলেও **১৯৬৯** সালে গ্রন্থাগারে প্রকাশিত হয়। ঐ বছর **২১**শে ফেব্রুয়ারি কলকাতা থিয়েটার নাটকটির অভিনয় করে। কৃষক আন্দোলনের পটভূমিকায় নাটকটি রচিত। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের আদিবাসী সাঁওতাল ও বাউড়িদের জীবন যাপন, তাদের ওপর মহাজনের শোষন, অত্যাচার, লাঞ্ছনা, বঞ্চনার চিত্র নাটকটিতে ফুটে উঠেছে। 'নবান্ন' এর হরিদত্ত ও কালীধন ধাড়া এই দুই কুটচক্রীর সমাজ কলুষিত সত্ত্বার মিলিত একক প্রকাশ পেয়েছে 'দেবীগর্জন' এর প্রভঞ্জনের মধ্যে। প্রভঞ্জনের কালোবাজারি ও জোতদারই শুধু নয়, তার কামনা কুটিল দৃষ্টি এবং নারী লোলুপতাও ছিল ভয়ংকর। প্রভঞ্জনের কুটচক্রের জালে পরে সর্দারের সোনার সংসার তাসের ঘরের মতো ভেঙে যায়। এ কাজে তার অন্যতম দোসর ঘরের শত্রু বিভীষণ ত্রিভুবন। তবে প্রভঞ্জন ও ত্রিভুবনের কূটনৈতিকতায় শেষ কথা নয়। শোষিত বঞ্চিত সাঁওতাল কৃষকরা (সর্দার, মংলা, সঞ্চরিয়া, দাশুসর্দার, গিরি প্রমুখ) এই সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ব্যাবস্থার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়েছে। খড়কুটোর মতো তলিয়ে গেছে প্রভঞ্জনের দল। নাটকের শেষে সামন্ততান্ত্রিক শোষণব্যাবস্থা উৎখাত করে আকাশে বাতাসে মুখরিত হয়েছে দেবীগর্জনের প্রতিধ্বনি। নাটকে পরিনতিতে শোষিত শ্রেনির জয় আসলে গননাট্য বিষয় ভাবনার ফসল।

গণনাট্য আন্দোলন বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে এবং আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবোধে যে আলোড়ন সৃষ্টি করে প্রসিদ্ধ লাভ করেছে, তার প্রাণপুরুষ বিজন ভট্টাচার্য।তাঁর নাটক চিরপরিচিত চরিত্র, বিষয় ও আঙ্গিকের অস্বাভাবিক অভিনবত্বের দীপ্তি নিয়ে জনগণের মনে নতুন চেতনার ঢেউ তুলেছিল। সাধারণ মানুষের জীবন সমস্যা তাঁর নাটকে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। কৃষক, শ্রমিক, বস্তিবাসী, আদিবাসী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের চরিত্র নাট্যকারের সহানুভূতি স্পর্শে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে তাঁর নাটকে উঠে এসেছে তৎকালীন সমাজজীবনের দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের ওপর অত্যাচার, শাসন ও শোষণের অন্ধকার দিকটি।যে জীবন একান্তভাবে বাস্তব তার ভয়াবহ কুৎসিত দিকটি যেমন নাট্যকার তুলে ধরেছেন তেমনি কখনও সুন্দর মনোমুগ্ধকর ছবিও তাঁর নাটকে চিত্রায়িত হয়েছে। বিজন ভট্টাচার্যের শিল্পী মনন ও শিল্পী প্রতিভার মধ্যে ছিল প্রতিরোধ ও প্রতিবাদী মানসিকতা। তাঁর প্রায় সব নাটকেই কম বেশি এই মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে। তাঁর নাটকেই প্রথম আমরা খুঁজে পায় গণজীবনের প্রতিচ্ছবি। তাই সর্বদিক বিচারে একথা বলা যায় যে, গণনাট্য আন্দোলনের আলোচনা প্রসঙ্গে বিজন ভট্টাচার্যের নাটকগুলি বাংলা নাট্যমঞ্চ ও নাট্য সাহিত্যের ভুবনে সর্বদা সম মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।

তথ্যসূত্র :

১. রায়, মন্দিরা, গণনাট্য ও নবনাট্য, একটি বিতর্ক, বামা পুস্তকালয়, ২০০৪, কলকাতা, পৃ. ৪
২. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড, এ.মুখার্জি এন্ড কোং প্রা.লি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ. ৪৪৪
৩. চৌধুরী, দর্শন, গণনাট্য আন্দোলন, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুন, ১৯৯৪, পৃ. ৩৩
৪. ভট্টাচার্য, বিজন, নবান্ন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দশম সংস্করণ, জুলাই, ২০১৮, পৃ. ২৭
৫. ভট্টাচার্য, বিজন, আগুন (দৃশ্য-৫), বহুরূপী, সংখ্যা-৩৩, অক্টোবর, ১৯৬৯, পৃ. ৩৯
৬. তদেব, পৃ. ৪০
৭. ভট্টাচার্য, বিজন, জবানবন্দি (দৃশ্য-৪), বহুরূপী, সংখ্যা-৩৪, জুন, ১৯৭০, পৃ. ৪১